‎জমি চাষে দুশ্চিন্তায় কৃষক, তেলের অপেক্ষায় পাম্পে ট্রাক্টরের দীর্ঘ লাইন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সরকারিভাবে তেল সংকট না থাকলেও বৈষম্যের মাধ্যমে তেল বিক্রির অভিযোগ তুলেছেন কৃষকরা। সিন্ডিকেট করে তেল সংকট তৈরী করছে একটি মহল।

‎মেহেরপুরে তেলের সংকটে শুধু মোটরসাইকেল নয়, জমি চাষের কাজে ব্যবহৃত ট্রাক্টরের দীর্ঘ লাইনও এখন চোখে পড়ছে পেট্রোল পাম্পগুলোতে। ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও পর্যাপ্ত তেল না পাওয়ায় সময়মতো জমি চাষ করতে পারছেন না ট্রাক্টর মালিকরা।

‎এতে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা। স্থানীয় সিন্ডিকেট আর বৈষম্যের মাধ্যমে তেল বিক্রয়ের অভিযোগ করেছেন কৃষকরা। আজ শুক্রবার ভোর তিনটার সময় থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে অবশেষে হামলার শিকার হলেন গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের কৃষক কামাল হোসেন।

‎কামাল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, আমি দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর তেল নিতে গেলে আমার সামনে চার-পাঁচজন জোরপূর্বক মেশিন কেড়ে নিয়ে ট্যাঙ্কি ভর্তি করে তেল নিয়ে যাচ্ছিল। জোরপূর্বক তেল ‎নেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ করাই পাম্পে থাকা সিন্ডিকেটের লোকজন আমার উপর অতর্কিত হামলা করেছে। আমি বিএনপি করি, বিএনপির লোকজন আমাকে মেরেছে, আমি নেতা কর্মীদের অবগত করছি।

‎ট্রাক্টর চালকদের অভিযোগ, তাদের যেখানে ৭০ থেকে ৮০ লিটার ডিজেলের প্রয়োজন, সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার পর মিলছে মাত্র ১০ থেকে ১৫ লিটার তেল। এই সীমিত তেল নিয়ে মাঠের কাজ চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

‎তবে জেলার উপজেলা কৃষি অফিস গুলো থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ভিত্তিতে ডিজেল কার্ড দেওয়া হচ্ছে। এই কার্ডের মাধ্যমে ট্রাক্টরের জন্য একদিনে ৫০ লিটার, পাওয়ার টিলারের জন্য দুই দিনে ২০ লিটার এবং সেচ ইঞ্জিনের জন্য দুই দিনে ১০ লিটার তেল বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে। ইতোমধ্যে কৃষি অফিসগুলোতে ডিজেল কার্ড সংগ্রহ

করতে ভিড়ও লক্ষ্য করা গেছে।

‎পাম্পে অপেক্ষমাণ ট্রাক্টর চালকরা জানান, সকাল থেকে লাইনে থাকলেও কখন তেল মিলবে তা নিশ্চিত নয়। তেল পেলেই মাঠে নামবেন, কিন্তু বিলম্বের কারণে কৃষিকাজ ব্যাহত হচ্ছে। তাদের মতে, সময়মতো জমি চাষ করা না গেলে বীজ বপনে দেরি হবে এবং ফসলও নামলা হয়ে যেতে পারে।

‎পাম্পে তেল নিতে আসা ট্রাক্টর চালক মহিবুল বলেন, ভোর থেকেই তিনি ট্রাক্টরে তেল নেওয়ার জন্য পাম্পে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু দুপুর হয়ে গেলেও কখন তেল পাবেন, তা নিশ্চিত নন। প্রয়োজন ৭০ থেকে ৮০ লিটার হলেও দেওয়া হচ্ছে মাত্র ১০ থেকে ১৫ লিটার।
‎এতে জমি ঠিকমতো চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না।

তিনি বলেন, গম কাটা প্রায় শেষ, এখন পাট বোনার সময়, এজন্য জমি চাষ দেওয়া জরুরি। তাই দ্রুত ট্রাক্টরগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তেল দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

‎ট্রাক্টর চালক ও মালিক সাইদ জানান, সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে মাত্র এক হাজার টাকার তেল পেয়েছেন, যা কাজে লাগার মতো নয়। এতে একদিকে সময় নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে কাজও বন্ধ থাকছে। তিনি বলেন, এভাবে চললে কাজ করা সম্ভব না, এবং ট্রাক্টর চালকদের জন্য সন্ধ্যার পর তেল দেওয়ার ব্যবস্থা করার দাবি জানান।

‎ট্রাক্টর চালক শফি বলেন, পাম্পে চাহিদা অনুযায়ী তেল না পেয়ে তিনি কৃষি অফিসে ডিজেল কার্ড নিতে এসেছেন। শুনেছেন, কার্ড থাকলে একদিনে ৫০ লিটার তেল পাওয়া যাবে এবং এই কার্ডের মাধ্যমে মাঠে ট্রাক্টর রেখেই তেল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এতে কিছুটা হলেও ভোগান্তি কমবে বলে আশা করছেন তিনি।

‎এদিকে কৃষকরাও পড়েছেন অনিশ্চয়তায়। চাষি আলী আজগর বলেন, ডিজেলের অভাবে ট্রাক্টর চালকরা জমি চাষ করতে পারছেন না। গম কাটা শেষ হওয়ায় এখন পাট ও আউশ ধানের আবাদ শুরু করার সময়। তিনি বলেন, এই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই প্রশাসনের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

‎এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়র রহমান বলেন, বর্তমান সময়ে জমি চাষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের অনুমতিক্রমে কৃষি যন্ত্রের জন্য ডিজেল কার্ড চালু করা

হয়েছে। পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ও সেচ পাম্প মালিকদের মাঠ পর্যায়ে যাচাই-বাছাই করে এই কার্ড দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, পাম্প মালিক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যে কার্ড বিতরণ শুরু হয়েছে। এর আগে গম কাটার কম্বাইন হারভেস্টারের জন্যও একই ধরনের কার্ড চালু ছিল।‎

‎মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, ট্রাক্টর চালকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তেল দেওয়ার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, সব পাম্পে একসঙ্গে তেল পৌঁছায় না, তাই সকাল থেকেই তেল বিতরণ করার কথা বলা হয়েছে। তবে ট্রাক্টর চালকদের সন্ধ্যার পর তেল দেওয়ার দাবি গ্রহণ করা হয়নি, কারণ এতে আবার নতুন করে সমস্যা তৈরি হতে পারে।

কোটচাঁদপুরে বাণিজ্যিকভাবে প্রথম ব্রোকলির চাষ

বাণিজ্যিকভাবে প্রথম ব্রোকলির চাষ হয়েছে কোটচাঁদপুরে। ব্রোকলি উচ্চ মূল্যের ক্যান্সার প্রতিরোধী একটি সবজি।

এছাড়া স্বল্প ব্যয়ে, কম সময়ে ভালো ফলন হয় সবজিটিতে। এ কারণে এই সবজি চাষ করে আগামীতে চাষিরা অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

পাশের গ্রামের সাবেক স্কুল শিক্ষক কলিম উদ্দিন বলেন, আমার ৭০ বছর জীবনে এমন কপির চাষ কোনো দিন দেখি নাই। এ কারণে খবর পেয়ে দেখতে এসেছি। জানতে পারলাম এ কপি অনেক পুষ্টিগুণ সম্পন্ন।

ওই গ্রামের আয়না খাতুন বলেন, এমন কপির চাষ আগে কোনোদিন দেখিনি এ গ্রামে। তবে এ কপি দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও সুস্বাদু। আর অধিক পুষ্টি আছে বলে জানতে পেরেছি।

এর আগে এমন চাষ দেখেনি তহুরা খাতুনও। তিনি বলেন, কপির মতো দেখতে। তবে কপির তুলনায় খেতে বেশ স্বাধের এ সবজিটি।

চাষি মোস্তাক আহম্মেদ বলেন, নতুন ফসলের চাষ করা আমার একটা শখ। আর এসব নতুন ফসলের ধারনা নিয়ে থাকি আমি ইউটিউব দেখে। এরপর চাষ করি। গেল বছর আমার নতুন চাষ ছিল রঙ্গিন ফুলকপি। এর ধারাবাহিকতায় এ বছর আমি চাষ করেছি ব্রোকলির। এছাড়া এর পাশাপাশি আমার চাষ রয়েছে মালটা, আম, পেয়ারা ও কলার ।

তিনি বলেন, ব্রোকলি অন্যান্য চাষের তুলনায় একটু ভিন্ন ধর্মী ফসল। এটা অল্প সময়ে, কম টাকা ব্যয় করে ফসল উৎপাদন করা যায়। লাভের পরিমাণ বেশি। তিনি ভুট্রার চাষের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, আমরা অনেকে ভূট্রার চাষ করে থাকি। যা এক বিঘা চাষ করতে ব্যয় হয় ২০/২২ হাজার টাকা। উৎপাদন খরচ বাদ দিলে লাভ হয় মাত্র ২০ হাজার টাকা। সেখানে এক বিঘা ব্রোকলি সর্বোচ্চ ব্যয় হয় ১০ হাজার টাকা। উৎপাদন খরচ বাদে লাভ হয় ৫০/৬০ হাজার টাকা। এছাড়া এ চাষ করতে লাগে না তেমন কোনো কীটনাশকের ব্যবহার।

মোস্তাক বলেন, ব্রোকলি একটি অতি পুষ্টি সম্বলিত সবজি। রয়েছে বাজারে বেশ চাহিদা। বিক্রি করতে পড়তে হয় না কোনো সমস্যায়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম বলেন, ব্রোকলি কপি জাতীয় সবজি। এটা যেমন কপির মতো তরকারি রান্না খাওয়া যায়। তেমনি খাওয়া যায় লুডুস ও সালাত হিসেবেও। এটা একটা উচ্চমূল্যের সবজি। ব্রোকলি ক্যান্সার প্রতিরোধী সবজি।

তিনি বলেন, এ সবজিটি মাত্র ৭০ দিনের মধ্যে বাজারজাত করা যায়। আর কম সময়ে চাষিরা ৮০/৯০ হাজার টাকা লাভবান হতে পারে।

তিনি আরো বলেন, কোটচাঁদপুরে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে ব্রোকলির চাষ মোস্তাক হোসেন নামের এক চাষি শিবনগর মাঠে। তুলনামূলক ভাবে ফুল কপি, বাধা কপির তুলনায় বেশ লাভ জনক চাষ। এ বছর কোটচাঁদপুরে ৯৯ হেক্টর জমিতে কপির চাষ হয়েছে। এর মধ্যে বাঁধা কপি ৪৮ হেক্টর ও ৫১ হেক্টর জমিতে ফুল কপি রয়েছে।

মেহেরপুর সদর কৃষি অফিসে দুদকের অভিযান

সরকার প্রদত্ত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে প্রণোদনায় অনিয়ম, মৃত ব্যক্তির নামে বিল-ভাউচারসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানের বিরুদ্ধে। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিসে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গতকাল সোমবার দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সদর উপজেলা কৃষি অফিসে এই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। পরে তদন্ত দল উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে প্রণোদনা পাওয়া কৃষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরেজমিন তদন্ত শুরু করে।

তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত দলের নেতৃত্ব দেন দুদকের কুষ্টিয়া অঞ্চলের সহকারী পরিচালক বিজন কুমার রায়। তিনি জানান, কৃষি প্রণোদনার আওতায় একাধিক প্রকল্পে মৃত ব্যক্তির নামে প্রকল্প প্রদান ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে চার হাজার কৃষককে প্রণোদনা দেয়ার ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত চলছে।

তিনি আরও জানান, তদন্ত টিম ইতোমধ্যে প্রণোদনা পাওয়া কৃষকদের তালিকা ও সংশ্লিষ্ট নথি সংগ্রহ করেছে। মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে যাচাই-বাছাই শেষে পুরো প্রতিবেদন দুদকের প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হবে।

‘বিষ’ চাষের প্রস্তুতি মহাসমারোহে

নিল রঙের নেট দিয়ে একটি জমিকে ঘিরে তার মধ্যে ছোট ছোট বীজতলা, বীজতলার পাশে বিভিন্ন ধরণের সবজি ও ফুলের গাছ ।

সামনের দিকে প্রবেশের জন্য সুন্দর একটি ফটক। দুর থেকে একটি

সুন্দর আয়োজন মনে হলেও ভয়ঙ্কর অসুন্দর আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে বিষ চাষ অর্থাৎ তামাকের চারা উৎপাদনের জন্য। পুরো জেলা জুড়ে এ চিত্র প্রায় শতাধিক।

মেহেরপুর শহর ছেড়ে কাথুলী সড়কের বিভিন্ন স্থানসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে এমন ভয়ঙ্কর প্রস্তুতি মহাসমারোহে চলছে তামাকের চারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায়। এ সড়কের মোনাহারপুর কবরস্থান থেকে কুলবাড়িয়া ইটভাটা মাত্র আধা কিলোমিটারের মধ্যেই এ ধরণের বীজতলা তৈরি করা হয়েছে ৬টি। এর মধ্যে বৃটিশ আমেরিকান টোব্যকোর (বিএটি) ৩টি, আবুল খায়ের গ্রুপের ২টি এবং জাপান টোব্যকো ইন্ডাস্ট্রিজের ১টি। তামাক কোম্পানীগুলোর লোভনীয় ফাঁদে পড়ে সাধারণ কৃষকরাই ঝুঁকছেন এ বিষ চাষে। এক মাস ১০ দিনের এ বীজতলা থেকে চারা উৎপাদনের পর সেগুলো হাজার হাজার বিঘা জমিতে চাষ করা হবে। চোখের সামনে ভয়ঙ্কর এ আয়োজন যেন চলছে বছরের পর বছর।

মেহেরপুর জেলায় গত বছর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তামাক চাষ হয়েছে ৯৭৫ হেক্টর অর্থাৎ ৭ হাজার ৩১২ বিঘা জমিতে। তামাকের আবাদ এবছর আরও সম্প্রসারণ করতে ইতিমধ্যে তামাকের চারা উৎপাদনের জন্য এ বীজতলাগুলো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।
তামাকের এ আগ্রাসনের ফলে সবজি উৎপাদনের জেলায় প্রতিনিয়ত সবজি উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। তামাক চাষের ফলে আবাদি জমির উর্বরতা শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। তামাক উৎপাদনের সাথে জড়িত নারী-শিশুসহ বয়স্ক মানুষজন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এ জেলার ঘরে ঘরে ফুসফুস, শ্বাসকষ্টসহ ক্যান্সারের মত মরণব্যাধি দেখা দেবে। এত কিছু জানার পরও তামাক কোম্পানীর গুলোর লোভনীয় ফাঁদে পড়ে কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা পেতে সাধারণ কৃষকরা তামাক আবাদে ঝুঁকে সবজি উৎপাদনের জমিগুলোর উর্বরতা নষ্ট করছেন।

জেলায় কয়েকটি তামাক ক্রয়ের কোম্পানি আছে। এগুলোর মধ্যে বৃটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো, জাপান টোব্যাকো, আবুল খায়ের টোব্যাকো কৃষকদের বিভিন্নভাবে প্রণোদনা দিয়ে থাকে। এই কোম্পানিগুলোর এলাকাভিত্তিক নিজস্ব তামাক চাষীদের তালিকা আছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি কোম্পানির আলাদাভাবে তালিকা থাকে। সেই তালিকা ধরে প্রণোদনা হিসেবে বিনামূল্যে বীজ, ঋণ হিসেবে বাজারদরে সার, কীটনাশক (যা তামাক ক্রয়ের পরে মূল্যের সঙ্গে পরবর্তীতে সমন্বয় করা হয়) এবং নগদ টাকাও ঋণ দেয়। এগুলো দিয়েই শেষ না বীজতলা থেকে যাতে কাঙ্খিত চারা উৎপাদন হয় এবং চাষ করা হয় সে পর্যন্ত তদারকি

করে থাকের কোম্পানীর প্রতিনিধিরা।

গতকাল রবিবার সকালে মেহেরপুর -কাথুলী সড়কের মোনাহারপুর মাঠে বিএটির তত্ত্বাবধানে একটি বীজতলার তৈরির কাজ করছিলেন কয়েকজন কৃষক। তাঁদের সাথে কথা বলা জানা গেছে , ৮ থেকে ১০ জন কৃষক মিলে এক বিঘার একটি বীজতলা তৈরি করেছেন। যা থেকে যে চারা উৎপাদন হবে তা প্রায় দেড়শ বিঘা জমির তামাক আবাদ করা যাবে।

বীজতলার মালিক মো : হিরো বলেন , তাঁদের এ বীজতলাটি তৈরি করতে প্রায় এক লাখ টাকা খরচ হয়েছে। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে তারপর অন্য কৃষকদের কাছে চারা বিক্রি করবেন। বীজতলা তৈরির জন্য বিএটি থেকে নেট , বীজ ও কীটনাশক দিয়েছেন ঋণ হিসেবে পরে তামাক বিক্রয়ের সময়ে সেখান থেকে টাকা কেটে নেই।

হিরো আরও বলেন , তামাক চাষ করে খুব বেশি লাভ হয় না। তবু তামাক কোম্পানীগুলোর পিড়াপিড়াতে করতে হয়।

কথা হয় তামাক চাষী উজুলপুর গ্রামের আবু হানিফের সাথে। তিনি বলেন , আমার সাড়ে তিন একর জমির চাষ করার কার্ড রয়েছে। গত বছর ১০ বিঘা জমিতে চাষ করেছি। ভালো লাভ হয়নি। চাষিদের লজ্জা নেই , তাই লস হলেও করি। এবার কতবিঘা চাষ করবো এখনো বলা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, কোম্পানীর কার্ড থাকায় তামাক বিক্রি করে টাকা পেতে সমস্যা হয়না বলে আবু হানিফ জানান।

একই গ্রামের মঈনদ্দিন নামের আরেক কৃষক বলেন , তামাক চাষ করলে ক্ষতি হয়। তামাক জ্বালানোর সময় শরীর জ্বরে , চুলকায় এবং শ্বাষকষ্ট হয়। গত বছর দুই বিঘা তামাকের চাষ করলেও এ বছর না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এচাষে শরীরের ক্ষতি ছাড়াও জমিরও অনেক ক্ষতি হয়।

মিনারুল ইসলাম নামের আরেক কৃষক বলেন , এক বিঘা তামাক চাষ করতে ৭ /৮ বস্তা সার লাগে। বেশি লাগে ড্যাপ (ডিএপি) সার। তামাক কোম্পানী থেকে শুধু এসওপি সার দেয় বাকি সার বাজার থেকেই কিনতে হয়।

বীজতলা পরিচর্যার দেখভাল করছিলেন বৃটিশ আমেরিকান টোব্যকো বিএটির লিফ ম্যানেজার তানভির হোসেন , মেহেরপুরে মোট কতটি বীজতলা করা হয়েছে এবং কি পরিমাণ জমিতে তামাক চাষ করার লক্ষ্যমাত্রা আছে তা তিনি জানাতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন , জার্মিনেশনের উপর ভিত্তি করে তামাক চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বীজগুলো

যাতে ভালোভাবে জার্মিনেশন হয়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সূত্র মতে, মেহেরপুর জেলায় ৯৭৫ হেক্টর জমিতে গত বছর তামাকের চাষ হয়েছে। জেলায় মোট আবাদি জমি রয়েছে ৫৮ হাজার ৫০৭ হেক্টর।

কৃষি অফিসের তথ্য মতে প্রতি বিঘা জমিতে জমিতে তামাক চাষ করতে ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি ডিএপি, ৫০ কেজি এসওপি, ১ কেজি দস্তা ও আধা কেজি বোরণ প্রয়োজন হয়।

কিন্তু কৃষকদের তথ্যমতে প্রতিবিঘা জমিতে ৭/৮ বস্তা সার লাগে। বেশি লাগে ডিএপি সার। তামাক চাষ করার জন্য তামাক কোম্পানীগুলো শুধুমাত্র এসওপি সার সরবরাহ করে। বাকি সারগুলো সাধারণ খুচরা সার ডিলার ও সার ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে সংগ্রহ করেন চাষীরা। কৃষি বিভাগ থেকে তামাকের জন্য কোন সার বরাদ্দ না থাকলেও কৃষকরা বিভিন্ন ফসলের নাম করে তামাকের সার সংগ্রহ করেন। যার ফলে প্রতিবছর তামাক মৌসুম শুরু হওয়ার আগে সারের কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি হয়।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক জেসমিন ফেরদৌস বলেন, তামাকচাষে নিরুৎসাহীত করতে কৃষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ, উঠান বৈঠক ও লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। তামাকে বিপরীতে পেঁপের চাষ করতে উদ্ধুদ্ধ করা হয়েছে। আশা করছি গতবছরের তুলনায় এবছর কিছু হলেও তামাকের চাষ কমবে।

সার সঙ্কটের বিষয়ে তিনি বলেন, চাষীরা প্রয়োজনের তুলনায় জমিতে অধিক সার ব্যবহার করেন। তাঁরা মনে করেন বেশি সার ব্যবহার করলে ফলন ভালো হয়। তবে আমরা এবছর অতিরিক্ত সারের চাহিদা পাঠিয়েছি।

তুলা চাষের সংকট ও সম্ভাবনা

স্বাধীনতা পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে এ দেশের বৈদেশিক আয়ের অন্যতম খাত ছিল পাট। ক্রমান্বয়ে পাটের চাহদিা নানাবিধ কারণে কমতে থাকে। মোটামুটি ৮০’ দশক থেকে আমাদের দেশে পোষাক শিল্পের বিকাশের সাথে

সাথে দেশের পুরাতন সুতাকল গুলোর উৎপাদন নুতন করে বাড়তে থাকে, সেইসাথে তুলাচাষের ব্যপক সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু সমস্যা হল দেশের উৎপাদিত তুলা স্থানীয় তাঁত শিল্পের চহিদাই ঠিকমত পূরণে সক্ষম ছিল না তার উপরে মানও তেমন উন্নত না হওয়ায় দেশে তুলা উৎপাদনে ব্যপক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভ’ত হয়।

১৯৭২ সনে তুলা চাষের উন্নয়নের জন্য এদেশে “ কটন বোর্ড” গঠিত হয় যা ছিল মূলত পাকিস্থান কটন বোর্ডের নতুন সংস্করণ। এই বোর্ড দেশের তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চল সমুহের মধ্যে সঠিক পদ্ধতীতে তুলা চাষের জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। সেই সময় ঢকার গাজীপুর ছাড়াও রঙপুর,বান্দরবন প্রভিতি স্থানে কটন বোর্ডের স্যাটেলাইট কেন্দ্র গড়ে ওঠে। কিন্তু এইসব কেন্দ্রে মটিভেসনাল কাজ বেশি হলেও গবেষণা কাজ তেমন ছিল না।

৮০’ দশকে পোষাক শিল্পের ব্যাপক উন্নয়নের জন্য আমদের দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ৮০% এই খাত থেকে অর্জিত হতে থাকে। গড়ে ওঠে নুতন নুতন আধুনিক স্পিনিং মিল বাড়তে থাকে কাচাঁতুলার চাহিদা। কিন্তু দেশে সে হারে তুলা উৎপাদিত না হওয়ায় প্রচুর পরিমান তুলা আমদানি করতে হয়। এবং বলতে গেলে আমরা এখনও আমদানি নির্ভর। বিশেষজ্ঞদের মতে সঠিক পরিচর্যা করলে দেশের চহিদার ৪০ থেকে ৫০ ভাগ তুলা দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব। এবং এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৮০ সনে দেশে আধুনিক মানের “ তুলা উন্নয়ন গবেষণা ও বীজ উৎপাদন খামার” প্রতিষ্ঠিত হয়।

মূলত এই প্রতিষ্ঠান সমতলে তুলাচাষ,বীজ উন্নয়ন, কৃষকদেও প্রশিক্ষণ সহ উন্নত জাত উদ্ভাবনে ব্যাপক ভাবে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে থাকে। এবং দেশের বিভিন্নস্থান যেমন রংপুর, শ্রীপুর, দিনাজপুর, রাঙ্গামাটি প্রভৃতি অঞ্চলে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে ব্যাপকভাবে কাজ করতে থাকে। গবেষণায় দেখা যায় দেশের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের পদ্মা অববাহিকা তুলাচাষের জন্য স¤ভাবনাময় এলাকা। এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে দেশের বৃহত্তর তুলা উন্নয়ন গবেষণা ও বীজ উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় যশোরের চৌগাছাতে। প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮২ থেকে ২০২৪ সন পর্যন্ত এই কেন্দ্র ১টি হায়ব্রিড (ঈই-১) সহ ৬টা উন্নত জতের তুলাবীজ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছড়াও এই প্রতিষ্ঠান চিন থেকে একটি উন্নত জাত আমদানি করে কৃষক পর্যায়ে বাজার জাত করে থাকে।

বর্তমানে দেশে প্রায় ৫০০ স্পিনিং মিল আছে এবং এই সব মিলের চাহদা

মেটানোর জন্য প্রতি বছর ভারত, পাকিস্থান, মিশর সহ বিভিন্ন দেশ থেকে সরকার তুলা আমদানি করে। তবে পরিতাপের বিষয় এ খাত যখন ক্রমাগত উন্নতির দিকে হাটছিল তখনি অসম বানিজ্যনীতির কারণে আমাদের এই সম্ভাবনাময় খাতটি হঠাৎ করেই ধ্বসে পড়ে। আমাদের পার্শবর্তি দেশ ভরতে সুতার মুল্য কম, এবং রঙ ও মান ভাল হওয়াই পোষাক শিল্প মালিক ও স্পিনিং মিল মালিকরা ব্যপক হারে কম শুল্কে স্থলপথে ভারত থেকে সুতা আমদানি করতে থাকে।

বাংলাদেশ হয়ে পড়ে কাচাঁ তুলা ও সুতার ভারতীয় বাজার। এতে আমাদের স্পিনিং শিলগুলো যেমন ক্রমেই বন্ধ হতে থাকে তেমনি অকার্যকর হতে থাকে সম্ভাবনাময় তুলা উন্নয়ন ও গবেষণা কাজ। ক্রমেই প্রতিষ্ঠানটির কার্যকলাপে নেমে আসে স্থবিরতা এবং পর্যাপ্ত বরাদ্ধের অভাবে চলতে থাকে জনবল ছাটায়। গবেষণা ও মটিভেশনাল কাজও এক সময় প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

সম্প্রতি ভারতের সাথে আমাদেওর দেশের বানিজ্যনীতির টান পোড়েনের জন্য ভারত সরকার আমাদের দেশে তুলা, সুতা ও তুলাজাত পন্য স্থলপথে রফতানী সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। এতে সংকট আরো ঘনিভ’ত হতে থাকে। ভারত সরকারের এমন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে হঠাৎ করেই বর্তমান কারখানাগুলো বড় ধরণের বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। কিন্তু সরকারের সময়চিত হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি দ্রুতই সমাধান হয়।

এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সরকার নিকটবর্তী দেশ ছাড়াও আফ্রীকা, মার্কিনযুক্তরাষ্ঠ্র ও দক্ষিন আমেরিকার কয়েকটি দেশ থেকে জরুরী তুলা আমদানীর অনুমতি দেন। সাথে সাথে সরকার অনুধাবন করেন যে, দেশের পোষাক শিল্প ও আনুসঙ্গিক তুলাজাতদ্রব্য উৎপাদন টিকিয়ে রাখার জন্য দেশে ব্যাপক তুলাচাষ ও উৎপাদন বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে সামনে রেখে সরকার সমতলের তুলাচাষের ব্যাপক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে যশোরের ”তুলা উন্নয়ন গবেষণা ও বীজ উৎপাদন খামারের” প্রতি নুতন কেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এবং এর উন্নয়নের জন্য যথাপুযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের উদে¦◌্যগ নেন, সংশ্লিষ্ঠ বিষেষজ্ঞরা ভারতের এই সিদ্ধান্তকে দেশের তুলাচাষের জন্য মঙ্গল বলেই মনে করছেন।

তবে এক্ষেত্রেও সরকার পরিচালিত অন্যান্য খামারের মত কিছু সমস্যার কথা উঠে আসে। সর্বত্র সক্ষমতার অভাব ও প্রকট জনবল সংকট ও সম্বয়হীনতা। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম লোকবল দিয়ে এখানে কাজ করা হয়, ফলে সঠিক গবেষণা ,মাঠপর্যায়ে কাজ করা কৃষকদের প্রশিক্ষণ

ও মটিভেষনাল কাজগুলো যথাযথভাবে করা সম্ভব হয় না। মাঠপর্যায়ে এখানকার উৎপাদিত বীজ কৃষদেও মাঝে বন্ঠন এবং ফলাফর সংরক্ষনের জন্য যে ধরণের শিক্ষীত কর্মী প্রয়োজন তেমনটা না থাকায় সব সময় সঠিক রেজাল্টও পাওয়া যায় না। তার পরেও এখানকার উৎপাদিত জাাত গুলোর চাহিদা অনেক বেশি বলে জানা যায়। হাই ব্রীড অপেক্ষা উন্নত জাত গুলোর চহিদা কৃষক পর্যায়ে বেশি। একইভাবে হাইব্রীড তুলা চাষের বাড়তি পরিচর্যা ও অতিরিক্তি খরচ ও কিছুটা ঝুকির বিষয়ও মাঠপর্যায় থেকে জানা যায়।

তুলাচাষের সম্ভাবনার মাঝেও বেশ কিছু সমস্যা চাষিদের কাছ থেকে উঠে আসে। চাষিদেও বক্তব্য থেকে জানা যায়, তুলার বলওয়র্ম একটা মারাত্তক বালায়, তাছাড়া পরিচর্য়ার অভাব, জিনিং অসুবিধা সহ বাজারজাত করণের অভাব ও সঠিক মুল্য না পাওয়াতে চাষিরা তুলাচাষে অনেক সময় আগ্রহ দেখান না। অথবা তুলা চাষে লাভবান হন না। তবে আশার কথা বিশেষজ্ঞগন এই সমস্যা সমাধানের জন্য যশোর কেন্দ্র থেকে তুলার সাথে সাথী ফসল চাষের বিশেষ পদ্ধতি আবিস্কার করেছেনে। ইতোমধ্যে এই পদ্ধতি কুষ্টিয়া সহ দেশের অন্যান্য এলাকাতেও বেশ আগ্রহের সৃস্টি হয়েছে।

বর্তমানে তুলা চাষে আবার গতি ফিরেছে। দেশে প্রায় ১০ জেলার ৬০০ হেক্টও জমিতে তুলা চাষ হয়েছে। এবং র্বমান সরকার তুলা চাষের উপরে কৃষকদের আগ্রহ সৃস্টির জন্য যশোর কেন্দ্ ্কে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। তুলা রবি ফসল এটা তামাক মৌসুমে ফলে থাকে। দরকার হলে তামাক চাষ সীমিত করে হলেও কৃষকদের তুলা চাষে উদ্বুদ্ধ করা দরকার বলে অনেকেই মনে করেন।

তুলাচষে ব্যপকতা সৃস্টি ও অধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যশোর কেন্দ্রের এই উজ্জীবনকে আমরা সাধুবাদ জানাই। সেই সাথে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার বেশকিছু সরকারী কৃষি খামারকেও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ঠ করার বিষয়ে ভেবে দেখার অনুরোধ এলকাবাসির। ইতোপূর্বে মেহেরপুরের মাটি ও জলবায়ু তুলাচাষের জন্য যথেষ্ঠ উপযোগী বলে কৃষি আধিদপ্তর থেকে জানানো হয়েছিল এবং ’৯০ দশকে বেশ কাজও হয়েছিল।

মেহেরপুরের যে ৩ /৪ টা কৃষি খামার আছে সেগুলোতে বর্তমান বাজার চাহিদা ও জাতীয় অর্থনীতিতে পোষাক শিল্পের অগ্রগতির কথা মাথায় রেখে মাঠ -ফসলের পাশাপাশি তুলা চাষের দিকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেয়া দরকার বলে এলাকাবাসি মনে করে। বিপুল সম্ভাবনাময় এই খাতকে কোন

ক্রমেই উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

প্রয়োজনে দক্ষজনবল, প্রশিক্ষণ ও যান্ত্রিক কাঠোমো উন্নয়নের মাধ্যমে তুলাচাষে আগ্রহী চাষিদেও আগ্রহী ও দক্ষ করে তুলতে পারলে একদিকে যেমন ক্ষতিকর তামাক চাষ কমে আসবে তেমনি দেশ আমদানি কৃত ৮০ লক্ষবেল তুলার বিপরিতে ৪০ থেকে ৬০ লক্ষ বেল তুলা দেশেই উৎপাদন করতে সক্ষম হবে; এবং দেশের প্রায় ৩৯ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

এক্ই সাথে পুঃনজাগরিত হবে স্পিনিং মিল, সুতা ও কাপড়কল। তুলাবীজ থেকে উৎপাদিত হবে উন্নত মানের ভেজ্যতেল ও পুষ্ঠিগুন সম্পন্ন খৈল যা উন্নত পশুখাদ্যের জন্য আমরা আমদানী করে থাকি। জাতীয়সার্থেই আমাদের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে এমনটাই আশাবাদ সকলের।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও পরিবেশবিদ

কোটচাঁদপুরে ব্যাগ ও গ্যাপ পদ্ধতিতে রপ্তানি যোগ্য আম চাষ

বিদেশে রপ্তানি উপযোগী করতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ব্যাগিং ও গ্যাপ পদ্ধতিতে আম চাষ করছেন স্থানীয় চাষিরা। কিন্তু পর্যাপ্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমটি এখনো রপ্তানি হচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় না থাকাই আম রপ্তানির প্রধান অন্তরায় বলে জানিয়েছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঝিনাইদহের উপ-পরিচালক ষষ্ঠী চন্দ্র রায়।

জানা যায়, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আম উৎপাদনকারী অঞ্চল কোটচাঁদপুর। সে অনুযায়ী এখানে আমের একটি শক্তিশালী বাজার গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলে উৎপাদিত আমের মধ্যে রয়েছে হিমসাগর, ল্যাংড়া, আম্রপালি, গোবিন্দ, বানানা, হাড়িভাঙ্গা, কাটিমন, বারি আম-৩, বারি আম-৪, বিশ্বনাথ ও মল্লিকা। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন জাতের আটির

আম।

এর মধ্যে চার জাতের আম বানানা, কাটিমন, হিমসাগর ও আম্রপালি বিদেশে রপ্তানি উপযোগী করে চাষ করা হচ্ছে। বানানা, কাটিমন ও হিমসাগর চাষ হচ্ছে ব্যাগিং পদ্ধতিতে এবং আম্রপালি চাষ হচ্ছে গ্যাপ পদ্ধতিতে। ফলে এই জাতগুলোর আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাও ভালো।

প্রায় ৪ বছর আগে কোটচাঁদপুরের কৃষক আব্দুল আজিজ প্রথম ব্যাগিং পদ্ধতিতে আম চাষ শুরু করেন। তার দেখাদেখি সলেমানপুর গ্রামের আবুল হোসেন, খোকা সরদার, রশিদ সরদার, জামাল সরদার ও আকবর আলীসহ আরও অনেক চাষি এই পদ্ধতিতে আম চাষ শুরু করেন। এ বছর প্রায় ৫০ হাজার ব্যাগে আম চাষ হয়েছে। গ্যাপ পদ্ধতিতেও আম চাষ হচ্ছে।

চাষি আবুল হোসেন জানান, তিনি ১০ বিঘা জমিতে আম্রপালি ও হিমসাগর আম চাষ করেছেন। এর মধ্যে ২ টন হিমসাগর ও ১০ টন আম্রপালি বিদেশে রপ্তানি উপযোগী হয়েছে। প্রতি ব্যাগে প্রায় ১ টাকা খরচ হলেও এই আম বাজারে ৫০–৮০ টাকা বেশি দামে বিক্রি হয়। ব্যাগিংয়ের ফলে আম থাকে প্রাকৃতিক, বিষমুক্ত ও পোকামাকড়হীন, যা বাজারে চাহিদা বাড়িয়েছে।

তিনি আরও বলেন, “যদি বিদেশে এই আম পাঠানো যেত, তাহলে চাষিরা আরও লাভবান হতেন এবং সরকারও পেত রাজস্ব। পাশাপাশি আরও অনেক চাষি বিষমুক্ত আম চাষে আগ্রহী হতেন।”

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন জানান, এ বছর কোটচাঁদপুর উপজেলায় ১৩ হাজার ৩০০ হেক্টর জমিতে আমের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় বেশি। তিনি বলেন, “আমি শুনেছি আগে ১–২ বার বায়ারের মাধ্যমে এখানকার আম রপ্তানি হয়েছিল। এবারও বায়ারদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।”

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্ঠী চন্দ্র রায় বলেন, “আমি বাজার ঘুরে দেখেছি, কোটচাঁদপুরে খুব ভালো মানের আম হয়। কিন্তু রপ্তানির জন্য কিছু কাজ করতে হবে।” তিনি জানান, ‘রপ্তানি যোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প’ নামের একটি সরকারি প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আম বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি বছর ইতোমধ্যে ৫ টন আম চীনে রপ্তানি করা হয়েছে। কিন্তু কোটচাঁদপুরের আম এই প্রকল্পের আওতায় না থাকায় এখান থেকে রপ্তানি সম্ভব হচ্ছে না।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, “আগামীতে কোটচাঁদপুরকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।”

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আনিসুল ইসলামের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি কল রিসিভ না করায় মন্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

দর্শনায় বারোমাসি কদবেল চাষে সফলতা পেয়েছেন তরিকুল ইসলাম

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা আনোয়ারপুর গ্রামে বারোমাসি জাতের কদবেল বাগান করে সফলতা পেয়েছেন উদ্যোক্তা তরিকুল ইসলাম এমনটাই দাবি করেছেন তিনি।

মেহেরপুর প্রতিদিনকে তিনি বলেন, “আমি এক জায়গায় ঘুরতে গিয়ে বারোমাসি কদবেল গাছের কিছু ডাল সংগ্রহ করে নিজ হাতে চারা তৈরি করে এই বাগান করেছি। আমার এই কদবেল বাগান ১ বিঘা জমির উপর গড়ে তোলা হয়েছে।”

তিনি বলেন, “চারা রোপণের নিয়ম খুবই সহজ। অন্যান্য সাধারণ গাছের মতো পরিমাণমতো গর্ত খুঁড়ে চারা রোপণ করতে হয়। প্রতিটি চারা ১২/১২ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পর জৈব সার দিতে হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হয়।”

প্রতি বিঘায় খরচ কেমন জানতে চাইলে তিনি বলেন, “জমি চাষ, চারা কেনা, সার কেনা ইত্যাদি মিলিয়ে ৪০-৫০ হাজার টাকা মতো খরচ হয়।”

গাছের রোগ দেখা দেয় কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, “কদবেল গাছে ছত্রাক ও জাব দেখা যায়। এক্ষেত্রে ওষুধ দিলে এর সমাধান হয়ে যায়।”

গাছের পরিচর্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, “বাগানের আগাছা পরিষ্কার করতে হবে, পানির প্রয়োজন হলে সেচ দিতে হবে। একটু দেখাশোনা করলেই এখান থেকে ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি। বারোমাসি কদবেল আমাদের দেশের আবহাওয়ার সাথেও মানিয়ে নিয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “আমার কদবেল বাগান নিয়ে অনেক স্বপ্ন রয়েছে এবং মেহেরপুর প্রতিদিনকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের মতো কৃষকদের সফলতার গল্প সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য।”

মেহেরপুরে মাশরুম চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় মাঠ দিবস পালিত

২০২৪-২৫ অর্থবছরে “মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ” প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুরে মাঠ দিবস পালন করা হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টায় সদর উপজেলা পরিষদের হলরুমে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (খামারবাড়ি) এর আয়োজনে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ আলমগীর বিশ্বাস।

তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “মাশরুম চাষ একটি সম্ভাবনাময় খাত। এটি পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারের কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনায় মাশরুম চাষকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।”

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. সামসুল আলম, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক মো. শায়খুল ইসলাম, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা কৃষি অফিসার মো. মনিরুজ্জামান, গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার মো. ইমরান হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. আশরাফুল আলম প্রমুখ।

মাশরুম চাষে সফলতা পেয়েছেন মিজানুর রহমান

পরীক্ষামূলকভাবে মাশরুম চাষে সফলতা পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগরের তরুণ উদ্যোক্তা মিজানুর রহমান।

মেহেরপুর প্রতিদিনকে তিনি জানান, "আমার ইচ্ছে ছিল নতুন কিছু চাষ করার। ইউটিউবে মাশরুম চাষ সম্পর্কে জানতে পেরে আগ্রহী হয়ে উঠি। এরপর জীবননগর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মনোহরপুর ইউনিয়নের দায়িত্বরত কৃষি কর্মকর্তা মোরশেদ বিল্লাহর সহযোগিতায় ৫০ কেজি বীজ সংগ্রহ করে প্রায় ২০০টি মাশরুম পলিব্যাগ তৈরি করি এবং পরীক্ষামূলকভাবে চাষ শুরু করি।"

তিনি আরও বলেন, "আমার চাষ করা মাশরুমগুলো ওয়েস্টার জাতের এবং বর্তমানে এগুলোর বয়স আড়াই মাস। মাশরুম পলিব্যাগ তৈরির জন্য আমি কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে কাঠের গুঁড়া ও মাশরুমের বীজ ব্যবহার করেছি। পরিচর্যার ক্ষেত্রে আহামরি কিছু করতে হয় না। তবে অতিরিক্ত গরমে দিনে ৩-৪ বার বাষ্প আকারে পানি স্প্রে করতে হয়।"

ছত্রাক সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক করে তিনি বলেন, "কোনো পলিব্যাগে ছত্রাক দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আলাদা করে ফেলতে হবে। না হলে অন্য পলিব্যাগগুলোও আক্রান্ত হবে।"

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় মাশরুম চাষের উপযোগিতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "মাশরুম মূলত শীতপ্রধান দেশে ভালো চাষ হয়। তাই চাষের জায়গাটি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন সেখানে সরাসরি রোদ না আসে এবং তাপমাত্রা ২২-২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। যদি গরম বেশি হয়, তাহলে সকালে, দুপুরে ও রাতে বাষ্প আকারে পানি স্প্রে করলেই সমাধান হয়ে যায়।"

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, "শুরুর দিকে আমার ২০০টি মাশরুম পলিব্যাগের মধ্যে প্রায় ৪০টি নষ্ট হয়ে যায়। তবে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করার ফলে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি—কীভাবে এটি তৈরি করতে হয় এবং কীভাবে পরিচর্যা করতে হয়। ভবিষ্যতে

বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। আপনারা সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন।”

এছাড়াও তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে ধন্যবাদ জানান তার মতো একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার গল্প তুলে ধরার জন্য।

ঝিনাইদহে বাড়ছে ঝুকিঁপূর্ণ তামাক চাষ

ঝিনাইদহে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে স্বাস্থ্যঝুকি পূর্ণ তামাক চাষ। তামাক চাষিদের সাথে প্রতিযোগিতায় গিয়ে প্রর্যাপ্ত সার পাচ্ছেন না পেঁয়াজ চাষিরা। জেলার শৈলকুপা ও হরিণাকুণ্ডুতে পেঁয়াজ ও অন্যান্য চাষিরা সার সংকটের অভিযোগ করেছেন।

অন্যান্য ফসলের তুলনায় বেশি লাভজনক হওয়াই প্রতিবছর সর্বনাশা তামাক চাষে আগ্রহী হচ্ছে এই অঞ্চলের চাষিরা। তামাকজাত পণ্যে বেশি ভ্যাট আরোপ ও বিজ্ঞাপনে নিষেধাজ্ঞা দিলেও তামাক চাষে কৃষকদের নিরুৎসাহীত করা যাচ্ছে না। ফলে কমে যাচ্ছে খাদ্যজাত, ডাল ও মসলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন। বিগত ৪ বছরে জেলায় তামাক চাষ বেড়েছে প্রায় দ্বিগুন।

জেলার শহরতলীতে ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোব্যাকোর তামাক ক্রয় কেন্দ্র থাকায় হাতের কাছে একটি নিশ্চিত বাজার তৈরি হয়েছে। সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগ ও মনিটরিং নেই বলেই বেশি লাভের আশায় কৃষক তামাক চাষে ঝুকছে এমন অভিযোগ সচেতন মহলের। তামাকের বেশি ফলন পেতে অতিরিক্ত সারের ব্যবহারে জেলার বিভিন্ন জায়গায় সারের সংকট দেখা দিয়েছে। জেলার ৬টি উপজেলায় কম-বেশি তামাক চাষ হলেও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা, শৈলকুপা, সদর ও মহেশপুরে বেশি হয়।

ঝিনাইদহ কৃষি বিভাগ বলছে, ব্রিটিশ-অ্যামেরিকান টোব্যাকো, জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনালসহ অন্যান্য তামাক বাজারজাতকারী কোম্পানিগুলো চাষিদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করছে। তারা তামাকের চারা রোপণ থেকে শুরু করে সার-কীটনাশক কেনার জন্য কৃষকদের অগ্রিম

টাকা প্রদান করে ও উৎপাদিত তামাক কেনার নিশ্চয়তা দেয়। এই কারণে খাদ্যজাতীয় ফসল বাদ দিয়ে এই অঞ্চলের কৃষকরা তামাক চাষের দিকে ঝুকছে। ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংগৃহীত তথ্যমতে, জেলায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৬০ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়। পরের বছর ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৫১ হেক্টর জমিতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৯৩ হেক্টর ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২২৪ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জেলার মহেশপুর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি ৮৪ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত হরিণাকুণ্ডু উপজেলাতে ১২৪ হেক্টর, ১০২ ও এবছর সর্বচ্চো ১৫৫ হেক্টর জমিতে তামাকের চাষ করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শরীফ মোহাম্মদ তিতুমীর বলেন, উপজেলায় সবচেয়ে বেশি চাঁদপুর ইউনিয়নে তামাক চাষ করা হয়েছে। তামাক চাষিরা তামাক বাজারজাতকারী কোম্পানির নিকট থেকে অগ্রিম আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে। একারণে চাষিরা তামাক চাষে ঝুকছে। তামাক চাষিদের চাহিদার কারণে অন্যান্য চাষিরা চাহিদা অনুযায়ী সার পাচ্ছে না। ফলে অন্যান্য ফসলের আবাদ ব্যহত হচ্ছে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার উদয়পুরের তামাক চাষি বিপ্লব বলেন, আলু-পেয়াজ চাষ করলে বাজারে কতদামে বিক্রি হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু তামাক চাষ করলে দেশে যুদ্ধ বাধুক বা দুর্ভীক্ষ হোক বিঘা প্রতি ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা লাভ দেয় কোম্পানি। একারণে তামাক চাষ করা। তিনি বলেন, গতবছর আমার ১০ বিঘা জমিতে তামাকের চাষ ছিল, এবছরও ১০ বিঘা করেছি।
খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, এক বিঘা জমিতে ৫০০-৬০০ কেজি তামাক উৎপাদন হয়। গতবছর কোম্পানি ২২৬ টাকা দরে প্রতিকেজি তামাক কেনে কৃষকের কাছ থেকে। উৎপাদিত তামাকের বিক্রি নিয়ে কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না। তামাকের বাজার স্থীর। কোম্পানিই কৃষকের কাছ থেকে সব তামাক কিনে নেয়। তামাক চাষে নিশ্চিৎ লাভ দেখে কৃষকরা অন্যান্য ফসল বাদ দিয়ে তামাক চাষে আগ্রহী হচ্ছে।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বড়-ভাদড়া গ্রামের কৃষক লিটন মোল্লা বলেন, এবছর এক বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছিলাম কিন্তু পরিপক্ক করে ক্ষেত থেকে তুলে বাজারে নিয়ে গিয়ে যে দামে বিক্রি করেছি তাতে বীজের দামই ওঠেনি। পানের বরজ আছে। বাকি টাকায় সার-কিনতে গেলে সারের ডিলাররা আমাদেরকে দিচ্ছে না। তামাক চাষিরা নগদ টাকায় সার কিনে ক্ষেতে দিচ্ছে। তামাকের ক্ষেতে সার লাগে বেশি। যেকারণে আমাদের ইউনিয়নে ঢ্যাপ সারের সংকট দেখা দিয়েছে।

সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে কাজ করা এনজিও পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ হাবিবুর রহমান বলেন, তামাক চাষিদের বাজারের একটা নিশ্চয়তা রয়েছে যা অন্যান্য ফসল চাষিদের বেলায় নেই। তামাক চাষিদের কোম্পানি থেকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করা হয় কিন্তু অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া খুব কষ্টের বিষয়। অন্যান্য ফসলের বাজারের অনিশ্চয়তা থেকেই মানুষ তামাক চাষে আগ্রহী হচ্ছে। তাছাড়া সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক প্রয়োগ ও মনিটরিং করেনা। কৃষি বিভাগও চাষের সঠিক পরিমাণ প্রকাশ না করে গোপন রাখে। তামাক যে একটি ক্ষতিকারক আবাদ এটা কৃষকরা জানেই না। যেকারণে তারাও নির্দিধায় চাষ করে যাচ্ছে। সরকার তৎপর হলেই ক্যাবল তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ও জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্য কৃষিবিদ ষষ্টি চন্দ্র রায় বলেন, আমরা তামাক চাষিদের বিকল্প ফসল চাষে উৎসাহিত করছি। তামাক কোম্পানিগুলো চাষিদের অগ্রিম অর্থ দেয় বলে জেনেছি। সরকার তামাক চাষ নিষিদ্ধ করেনি। কিন্তু আমরা নিয়মিত বিকল্প চাষে কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছি। আশা করা যায় আগামীতে তামাক চাষ এই জেলায় কম হবে।